ভূমিকা

"তুলনামূলক আলোচনার দর্পণে চৈতন্য জীবন বিষয়ক সংস্কৃত ও বাংলা রচনার মূল্যায়ন" নামক গবেষণা সন্দর্ভের উদ্দেশ্য তথ্যভিত্তিক চৈতন্য জীবন বিশ্লেষণ। সৌভাগ্যের কথা, সেকালের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতের ঐতিহাসিক সূত্রগুলি আজও লুপ্ত হয় নি। এগুলির সঙ্গে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি মিলিয়ে নিলেই চমকপ্রদ ফল পাওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ দেব মহিমার ধোঁয়াভরা পরিমন্ডলের বাইরে, বাস্তবের মানুষ, সামাজিক মানুষ, এমনকি রাজনীতি-সচেতন মানুষ চৈতন্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই।

এই গবেষণা কার্যে প্রধানতঃ অনুসরণ করেছি মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ কাব্য। কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত কাব্য, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল এইগুলিই চৈতন্যচরিতের আকর গ্রন্থরূপে পরিচিত। আধুনিক কালে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু দেশী বিদেশী পন্ডিত শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন। এই সকল গ্রন্থের যেটিকে সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাকেই আমি কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থে পদাবলী সাহিত্য ও বৈষ্ণব রস নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু প্রধান অসুবিধা এই যে আধুনিক পন্ডিত অনেকের রচনায় যেমন সুবিরোধিতা বর্তমান, তেমনি আবার বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য ও সুস্পষ্ট। অনেকের রচনাই একদেশদর্শী। আবার আকর গ্রন্থগুলিতেও সুবিরোধ যথেষ্ট, একের বিবরণের সঙ্গে অপরের সকল গ্রন্থে স্থান পায়নি। লেখকগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চৈতন্যচরিত রচনা ও

ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সুযোগ যেমন যথেষ্ট, তেমনি যথার্থ সত্যটি নিরূপণ করাও দুঃসাধ্য।

মোটকথা, চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলির কোন একটির মধ্যে সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয় নেই। তা ছাড়া, চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি ষোল আনাই খাঁটি এ কথা বলা চলে না। কতটা খাঁটি, কতটা ভেজাল বা প্রক্ষিপ্ত, তা বিচারসাপেক্ষ। অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথির উপর পরবর্তীকালের স্থূল হস্তাবলেপ ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্য-পার্ষদ ও অনুগামীদের মধ্যে শাখা সম্প্রদায়গত নানা কোন্দল যে দেখা দিয়েছিল, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে - এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের হাতে ন্যস্ত চৈতন্যচরিতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি অক্ষতই ছিল, একথা মনে করার কোন যুক্তি নেই। বরং সঙ্গত ভাবে মনে করা চলে, চৈতন্যভাগবতের আকস্মিক পরিসমাপ্তি, চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে চরিত গ্রন্থগুলির নীরবতা, চৈতন্যের জীবন কর্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী তথ্য পরিবেশন - এ সবের মূলে আছে চৈতন্য চরিতের পাণ্ডুলিপি গুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যের বিকার ও বিলোপ সাধন।

যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতা ও অবাস্তবতা চোখে না পড়ে পারে না। অবাস্তবতা ও অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ অধিকাংশ চৈতন্যচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছে। অবশ্য অ-লৌকিক হলেই তা অবাস্তব এমন কথা আমরা বলি না। চৈতন্য দেহে-মনে বড় মাপের মানুষ ছিলেন, অলোক সামান্য ছিল তাঁর প্রতিভা। অলৌকিকের যে অংশ অতিলৌকিক, তা লোকোত্তর, কিন্তু অবাস্তব নয়।

চৈতন্যচর্চা আজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে নতুন যাত্রা পেয়েছে। এই আলোচনা সন্দর্ভের মধ্য দিয়ে আমরা চৈতন্যকে বড় করে পাব যিনি ভারতীয় সংস্কৃতির চরম দুর্দিনে তাকে রক্ষা করেছিলেন, পরিপুষ্ট করেছিলেন, অফুরন্ত প্রাণবেগ সঞ্চার করে তাকে প্রবহমান

রেখেছিলেন। আবার এ কথাও সত্য যে মানুষের ইতিহাসে এই মাপের মানুষ বেশি মেলে না।

দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের সংঘাতে আমাদের পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় অবস্থান আজ বিপর্য্যস্ত। সবরকমের মূল্যবোধ বিধ্বস্ত। এ পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই গবেষণা গ্রন্থে মানবপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যের জীবনাদর্শকে, তাঁর জনকল্যানমুখী আন্দোলনের ইতিহাসটিকে যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যভিচার যখন আমাদের পীড়িত করছে, সংস্কৃতির বিকৃত প্রভাব আমাদের দুঃখের কারণ হচ্ছে, তখনই শ্রীচৈতন্যের জীবন দর্শনে মুক্তির পথ মিলবে - এ আশা দেশবাসী রাখে। আগামী শতকের যুক্তিবাদী মন শ্রীচৈতন্যের জীবনাচরণে অনেক কিছুই খুঁজে পাবে। মনে হয়, সেদিনও 'শিক্ষাষ্টক' তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না।

শ্রীচৈতন্য সমকালীন সমাজের প্রয়োজনে জন্ম নিলেও, এঁরা আসেন সম্পূর্ণ নতুন একটি সমাজ আর নতুন যুগ সৃষ্টির জন্যই। তাই এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের পাই অত্যন্ত অল্পসংখ্যায় আর এঁদের ঈশ্বরকোটির মানুষরূপে স্বীকার করি। বৃহৎ জনগোষ্ঠী এই বিরল মানুষদের কেন্দ্র করে নবজীবনের আশ্বাস পেয়ে থাকেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান বিষয়ে ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয় লিখেছেন - "There is no dearth of materials for a study of Caitanya's life and personality. A fairly large number of lives in Sanskrit and in Bengali came into existence not many years after his death; and they supply valuable materials not only regarding the details of his career, but also about the circumstances attending upon the growth of the movement

he initiated, its method, its extent and its contagion. They reproduce the atmosphere and depict in vivid outline the attractive figures of the leading actors in the scene. As some of these works are contemporary records, they embody personal impression and knowledge, and in this sense they are truly historical. But most of them already acknowledge the divinity of Caitanya and write from the devotional point of view. Biography is a distinctly Vaisnava contribution to Middle Bengali; and by creating it, the movement added a new genre to the literature of the country; but the prolix and exuberant metrical narratives are often presented in a distorted perspective by an imagination which is ready to go to the utmost limits, or want of limits, of fanatical devotion. The powerful impression made by a great personality inspired these men to give sincere expression to their human love and admiration, but the early deification of Caitanya made them accept as their model the myths and unrealities of their favourite Purāṇic stories. Miraculous legends and grotesquely absurd accounts about Caitanya appear to have rapidly grown up even during his life-time, and the pious credulity of these devout writers found no difficulty in reproducing them in all seriousness. Yet, beneath all this, we have a picture of great human interest and appeal; and the purely devotional aspect of Caitanya's career is depicted with sincere and loving care, with all the attending details and circumstances.[৬]

আসল কথা সর্বত্রই যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্যতা ও তুলনা-প্রমাণাদিই হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের মাপকাঠি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সাধারণত পরোক্ষদর্শীর বিবরণ অপেক্ষা অধিক

আস্থাযোগ্য। যে কোন জীবনী আলোচনা সম্পর্কে এই বিষয়গুলি অর্থাৎ কে কি বলেছেন, কে কোথাকার ও কবেকার কোন কাহিনী কতদূর যুক্তি সম্মত প্রভৃতি নিয়ম মানলেই ঐতিহাসিক বিচার সম্ভব। এ গবেষণা গ্রন্থে সংস্কৃত ও বাংলা আকর গ্রন্থগুলিকে ব্যবহার করে শ্রীচৈতন্যের বাস্তব জীবন ও মানবিক ক্রিয়া কলাপের যথাযথ মূল্যায়নের এই দীন প্রয়াস।

আলোচিতব্য গ্রন্থগুলির পরিচয় :

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম (মুরারি গুপ্তের কড়চা) -

মুরারি নবদ্বীপবাসী বৈদ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁকে চরিতাকাররা গৌরাঙ্গের সহপাঠীরূপে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবে তিনি গৌরাঙ্গের থেকে সম্ভবত কিছু বয়সে বড়ো ছিলেন।

শ্রী গৌরাঙ্গের নবদ্বীপে প্রথম জীবনের প্রায় ২৪ বৎসরকে নবদ্বীপলীলা ও পুরীতে শেষ জীবনের প্রায় ২৪ বৎসরকে পুরীলীলা (বা নীলাচললীলা) বলা হয়। মুরারি উভয়লীলাই দেখেছিলেন এবং নবদ্বীপলীলা তিনি ছাড়া আর কোনও চরিতকারই দেখেননি। কড়চা বা কর্চা শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা হিসাব। জীবনী অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু বাংলা নয়, সংস্কৃত রচনাকেও এ নাম দেওয়া হত। মুরারির গ্রন্থখানি পাই শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত নামে সংস্কৃতে রচিত একটি মহাকাব্যের রূপে, যা ৪টি প্রক্রমে এবং প্রতি প্রক্রম ক্রমান্বয়ে ১৬, ১৮, ১৮ ও ২৫টি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থটির সংস্কৃত ভাষা নির্ভুল নয়।

গ্রন্থখানি অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস থেকে প্রকাশিত। আমি ৪৫১ 'শ্রীগৌরাব্দ' অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রীঃ মুদ্রিত ৪র্থ সংস্করণ এ গবেষণা গ্রন্থে ব্যবহার করেছি। প্রকাশকেরা বলেছেন দুখানি পুঁথি দেখে তাঁরা গ্রন্থটি ছাপিয়েছেন। কিন্তু সে পুঁথি পুঁথিবিচারদক্ষ পন্ডিতেরা কেহ দেখতে না পাওয়ায় তার খাঁটিত্ব বা বয়স সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কিছুই জানা যায় না।

বইটিতে পরবর্তীকালে যে অনেক কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। ডঃ সুশীলকুমার দে লিখেছেন -

"The genuineness of the fourth and last section (as possibly also of the third), therefore, is not altogether beyond question; and the presumption has been made that the concluding verse, which gives its date of composition, originally occurred, as it should, at the end of the second section, but was somehow retained even when the supplementary section or sections were added."[২]

প্রাচীনকালে পুঁথির শেষে গ্রন্থকার গ্রন্থরচনাকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ থাকত, ইংরাজিতে তাকে colophon বলা হয়। সংস্কৃত পুঁথিতে গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সে অধ্যায়ে বিবৃত বিষয়ের সারকথা-জ্ঞাপক উক্তিকে পুষ্পিকা বলা হত। আজকাল অনেকে colophon অর্থে পুষ্পিকা-শব্দ ব্যবহার করছেন। পুষ্পিকায় গ্রন্থরচনার সাল তারিখ সম্বন্ধে যা অনেক গ্রন্থে দেখা যায়, তা সকল ক্ষেত্রে বিশ্বাস্য নয়, কারণ মূল গ্রন্থের প্রাচীনত্ব বাড়াবার উদ্দেশ্যে সেকালে পণ্ডিতেরা যেকি পুষ্পিকা জুড়ে দিতেন।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - "অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ যে আকারে প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে তাতে যে অনেক রূপান্তর সাধিত হয়েছে, তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের গবেষণা থেকে বুঝতে পারা যায়। বিমানবাবু দেখিয়েছেন যে, নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তি রত্নাকরে' মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের তৃতীয় প্রক্রম থেকে যে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, তা ঐ গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় প্রক্রম সপ্তম সর্গে পাওয়া যায় এবং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রক্রম পঞ্চম সর্গ থেকে যে শ্লোক 'ভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত হয়েছে, তা বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় প্রক্রম দশম সর্গে পাওয়া যায় (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', দ্বিতীয় সং, পৃ.৭৭)।"

অতএব, মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের যে সব অংশের উদ্ধৃতি বা প্রতিধ্বনি বা অনুবাদ 'ভক্তিরত্নাকর', 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' ও 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'(কবি কর্ণপুর বিরচিত)

'চৈতন্যমঙ্গল (লোচন দাস বিরচিত) প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলিকেই প্রামানিক বলে গ্রহণ করা যায়। বাদবাকি অংশের মধ্যে কতটা খাঁটি আর কতটা প্রক্ষিপ্ত, তা বলা সম্ভব নয়। প্রথম প্রক্রম দ্বিতীয় সর্গের চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কিত শ্লোকটিও প্রক্ষিপ্ত হতে পারে।

সুতরাং মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের রচনাকালের উর্ধ্বসীমা ১৫৩৩ না ধরে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ ধরা উচিত। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বৃন্দাবন ও আরও কয়েকটি স্থানে ভ্রমন করে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভ্রমনের বিবরণ ও প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী প্রসঙ্গ লোচন দাস তাঁর গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের (চতুর্থ-প্রক্রম, প্রথম থেকে ষোড়শ সর্গ ও একবিংশ সর্গ) বর্ণনার হুবহু মিল আছে, লোচন দাসও মুরারি গুপ্তের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। অতএব মুরারি গুপ্তের মূল গ্রন্থে যে অন্তত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চৈতন্যজীবনী বর্ণিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ১৫১৬ থেকে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে স্থির করা গেল। [৩]

চতুর্থ সংস্করণের পর রচনাটি নতুন সংস্করণরূপে আর কারও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। পুরানো সংস্করণের গ্রন্থটিতে যথেষ্ট পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন :- "গ্রন্থখানির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও ইহাতে অজস্র ভুল রহিয়াছে। কতকগুলি ভুল এমন মারাত্মক যে, অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। এই অবস্থায় গ্রন্থটির একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হলে সকলেই উপকৃত হতেন। গ্রন্থে ব্যবহৃত কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ এবং ত্রুটিপূর্ণ সন তারিখ ইত্যাদি পরিমার্জিত হলে অনেক বিষয়ের পাঠোদ্ধার সম্ভব হত। সেই সঙ্গে রচনাস্থিত ঐতিহাসিক উপাদানগুলিও সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হত।

শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীবাস একদিন মুরারিকে শ্রীগৌরহরির পরম সুন্দর চরিত কথা কীর্তন করতে বলেন। মুরারি তাঁর আজ্ঞায় এ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে মহাপ্রভুর লীলা-বিলাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। অবশ্য এই লীলাবিষয়ক গ্রন্থ রচনার পূর্বে তিনি মহাপ্রভুর কাছ থেকে অনুমতি ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। একথা মুরারি স্বয়ং স্বীকার করেছেন আলোচ্য চরিত রচনায় -

শ্রীমন্নারায়ণৌনাম গুপ্তঃ স্নেহার্ণবং গুরুম্।
যথা তবাবতারোহয়ং বক্তুমইতি সাম্প্রতম্॥
তথাজ্ঞাং গুরু দেবশং-তৎশ্রুত্বা সস্মিতাননঃ।
প্রাহ তং ভগবানস্য অথৈব সম্ভাবিষ্যতি॥
যদুদিষ্যত্যসৌ বৈদ্য স্তৎসত্যং ভবিষ্যতি। [৫]

- "প্রভু, আপনার ভক্ত রূপে এই মুরারি যেন তাঁর স্নেহসমুদ্র গুরুদেবের নামকীর্তন করতে পারে, তার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করছে। একথা শুনে ভগবান বললেন, - 'তথাস্তু। বৈদ্য যা বলবে, সেটাই সুসত্যরূপে গৃহীত হবে।"

এই চরিত-রচনায় মুরারি আরও একজনের কাছে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তিনি চৈতন্য-পার্ষদ দামোদর পন্ডিত। রচনাটিতে বক্তা - মুরারি এবং শ্রোতা - দামোদর। দামোদর পন্ডিতের এক একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মুরারি। প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এই চরিত-কাব্যটির সৃষ্টি।

আধুনিক পন্ডিতেরা কেহ গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য মনে করেন কিন্তু বোধ হয় তাহা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ পরমানন্দ সেন (কবি কর্ণপুর) শ্রীচৈতন্যের কতকটা সমসাময়িক ছিলেন এবং চৈতন্য তিরোধানের পরে বৎসর দশেকের মধ্যে তাঁর রচিত মহাকাব্যে তিনি বলেছেন যে মুরারির রচনা অবলম্বনে তিনি তা রচনা করেছেন। এ গবেষণা গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য লীলার ঐতিহ্য বিচারে আমি মুরারির বর্ণনাকে প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করেছি।

(২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্ - কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেন রচিত। কবিকর্ণপূর (সংক্ষেপে কর্ণপূর বলা হয়) উপাধিপ্রাপ্ত পরমানন্দ সেন ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লী) নিবাসী চিকিৎসা ব্যবসায়ী শিবানন্দের তৃতীয় পুত্র। তিনি বাল্যে ও কৈশোরে এবং হয়তো নবযৌবনেও মাতাপিতার সঙ্গে পুরীতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যকে দেখেছিলেন। কর্ণপূর বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে তিনখানি শ্রীচৈতন্যবিষয়ক - একটি মহাকাব্য, একটি নাটক এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। প্রথমে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যম্' নিয়ে আলোচনা করব। আমরা বাংলা ১৩৭৭ সালে মুদ্রিত, প্রাণকিশোর গোস্বামী সম্পাদিত গ্রন্থটি ব্যবহার করেছি। বিবিধ ছন্দোবদ্ধ বিশটি সর্গে ১২১১ শ্লোকে কবি কর্ণপূর এই মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের ৯ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৬৪ শকের (১৫৪২ খ্রী.অ.) এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে কবিকর্ণপূর এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ সর্গ পর্যন্ত রচনা (২০।৪২, ৪৩) এবং গ্রন্থশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। এই মহাকাব্যের নায়ক শ্রী গৌরচন্দ্র।

চৈতন্যদেবের প্রায় সমস্ত জীবনটাই এ গ্রন্থের মূল বর্ণিতব্য বিষয়। "রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে কবিকর্ণপূর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা'হলে 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনার সময় তাঁর বয়স হয় মাত্র ১৮ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে'র পুথির লিপিকর লিখেছেন মহাকাব্য রচনার সময় কবিকর্ণপূরের বয়স মাত্র ষোল বছর ছিল। কিন্তু এই দুই মতের কোনটিই গ্রহনযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে' যে কবিত্ব, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখা যায়, তা ২৪।২৫ বছরের আগে সম্ভব বলে মনে হয় না। অন্ততপক্ষে এই কাব্য যে ১৬ বা ১৮ বছরের বালকের রচনা নয়, তা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

মোটকথা 'চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে'র রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সমস্যা নেই। বইয়ের শেষে কবি লিখেছেন -

বেদাঃ রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে।
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি ॥
বারে সুধাকিরণনাম্যসিত দ্বিতীয়া তিথ্যন্তরে
পরি সমাপ্তিরভূদদ্ভুষ্য।।

এর থেকে বোঝা যায় ১৪৬৪ শকাব্দের আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে এই বই সমাপ্ত হয়েছিল।

(৩) চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্ - কবি কর্ণপূর রচিত।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' - নাটকের প্রথমাঙ্কের শুরুতেই সূত্রধার বলেছে - তদধুনা ধুলানঃ সন্দেহং চ কৃতার্থয়ন্নয়সহং শ্রীনাথেনানু গৃহীতেন তস্যৈব ভগবতোহবতো নিজ করুণাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদস্য শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নির্মিতং পরমানন্দদাসকবিনা বিনাশিত হৃৎ কষায় তিমিরং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটকমভিনীয় সমীহিতহিতস্য নৃপতেঃ করিষ্যামি।
- অর্থাৎ - তাই আমি এখন সন্দেহ ত্যাগ করে নিজ দেহকে ধন্য করে শ্রীনাথের দ্বারা অনুগৃহীত আর সেই করুণাময় চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ্ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ দাস কবির লেখা হৃদয়ান্ধকার-নাশক শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নামক নাটক অভিনয় করে এই রাজার অভিলাষ পূরণ করব।

সূত্রকারের সংলাপেই তা হলে নাটকের রচয়িতার নাম অ-বিতর্কিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। রচয়িতা শিবানন্দ সেনের পুত্র 'কবিকর্ণপূর' পরমানন্দ সেন। নাটকটির যথাযথ নাম - 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্'। গ্রন্থটি ১০ অঙ্কে বিভক্ত।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র শেষেও রচনাকাল নির্দেশক শ্লোক পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই,:—

শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরোহরি র্ধরণিমন্ডলে আবিরাসীৎ।
তস্মিং শ্চতুর্ণ বতিভাজি তদীয় লীলা-
গ্রন্থোহয়মা বিরভব্য কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

এর থেকে জানা যায় ১৪৯৪ শক = ১৫৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'চৈতন্যচন্দোদয় নাটক' রচিত হয়। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এই তারিখকে নাটকের রচনাকাল বলে মানতে অনিচ্ছুক। এই নাটক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল বলে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[৬]

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারও এক সময় এই মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি মতের পরিবর্তন করে ১৪৯৪ শকাব্দকেই 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'র রচনা সমাপ্তিকাল বলে গ্রহণ করেছেন।[৭]

গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ও তাতে ভক্তির প্রয়োজন প্রতিপাদন এবং বিরুদ্ধবাদিদিগকে তর্কে পরাস্ত করার যে প্রয়াস হয়েছে শ্রীচৈতন্যের আদিভক্তগণের জীবিতকালে তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তেরা এ সকল প্রয়োজন মোটেই অনুভব করেননি, তাঁরা শ্রীচৈতন্যের মধ্যে যা দেখেছিলেন বা অনুভব করেছিলেন তাতে পূর্ণতৃপ্তি লাভ করেছিলেন, দল বাড়ান বা অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাঁদের প্রয়োজন ছিল না। শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্তগণ নাটক রচনার পূর্বেই যে পরলোকগত হয়েছিলেন, একথার উল্লেখ নাটকের আদিতেই আছে। নাটকের কয়েকটি বিবরণে যেন কর্ণপূরের মহাকাব্যের কোন কোন বিষয়ের কিছু পরিপূরণ চেষ্টা দেখা যায়। এই সকল কারণে মনে হয় নাটকটি মহাকাব্যের বেশ কিছুকাল পরে রচিত এবং নান্দীবাক্যে কথিত শ্রীচৈতন্যের সত্যতিরোধানে শোকার্ত গজপতির শোকাপনোদনার্থে ইহার অভিনয়।

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হয় শ্রীচৈতন্য তিরোধানের প্রায় ৭-৮ বৎসর পরে (১৫৪০-৪১ খ্রীঃ) সুতরাং তার পূর্বে নাটকের রচনা সম্ভবত হয়নি। পুষ্পিকার সঙ্কেতানুসারে রচনাকাল দাঁড়ায়

১৫৭২ (কেহ অর্থ করেন ১৫৭৯ খ্রী: অর্থাৎ চৈতন্যতিরোধানের ৪০ থেকে ৪৫ বৎসর পরে। অতএব প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর প্রায় ৩২-৩৮ বৎসর পরে। পুষ্পিকার তারিখ কিন্তু পরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে, অথবা কোনও পুঁথি নকলের তারিখ হতে পারে, কারণ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের শেষদিকে (অন্ত্য, ৩) কর্ণপূর-নাটক হতে উদ্ধৃতি আছে এবং চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল সাধারণত এরপরে মনে করা হয় না। কর্ণপূরের নাটক সম্ভবত মহাকাব্যের প্রায় ১৫ বৎসর পরে রচিত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে।

কাব্য নাটক ইতিহাস নয়। ইতিহাসের কিছু মালমশলার সঙ্গে প্রভূত কবিকল্পনা সংযোগে কাব্যনাটকের সৃষ্টি হয় এবং সে প্রক্রিয়ার বহুক্ষেত্রে খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্যও কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। কাব্যনাটক হতে বাস্তব ইতিহাসের কতকটা অনুমান মাত্র হয়, স্থিরপ্রতিষ্ঠা হয়না। এ বিষয় কাব্যনাটক থেকে জীবনী নির্ধারণ সম্পর্কে সর্বদা মনে রাখতে হবে।

(৪) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা - কবি কর্ণপূর রচিত

শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণবতার দৃষ্টিতে দেখে ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলার প্রতিবিম্বরূপে কল্পনা করে তদনুযায়ী শ্রীচৈতন্য, তাঁর পরিকরগণ এবং ভক্ত সমাজের প্রত্যেকের 'তত্ত্ব-নিরূপণ' করেছেন। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের নামাদি পরিচায়ক এবং তত্ত্ব প্রকাশক তালিকা।

এ গ্রন্থের রচনাকাল কর্ণপূর-নাটকের পরে, কারণ এতে তাঁর মহাকাব্য ও নাটক উভয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি আছে। এ বই যে কিছু উত্তরকালের রচনা তার আরও প্রমাণ এই মহাকাব্য বা নাটকে নিত্যানন্দ প্রভুকে এবং শ্রীচৈতন্যর পুরীজীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী স্বরূপ দামোদরকে কর্ণপূর বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই কিন্তু এই পুস্তকে নিত্যানন্দ ও স্বরূপ, নিত্যানন্দের শ্বশুর কৃষ্ণদাস, পত্নীদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবা, পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাও শ্রদ্ধাস্পদ স্থান পেয়েছেন। অদ্বৈত প্রভুর পত্নীদ্বয় সীতা ও শ্রী, সীতার সহচরী নন্দিনী ও জঙ্গলী বিশিষ্ট সম্মান পেয়েছেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত ইতিমধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করায়

বৃন্দাবনগোস্বামীগণ প্রবর্তিত যে চৈতন্যাবতার-তত্ত্ব কর্ণপূরের মহাকাব্য বা নাটকে প্রকাশ পায় নি, তা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হওয়ায় কর্ণপূর শ্রীচৈতন্যের "স্বীকৃত্য রাধিকা-ভাবকান্তি" অবতারত্ব উল্লেখ করেছেন (২৬ শ্লোক)। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ১৫৭৬-৭৭ খ্রী: বইটির রচনাকাল।"

এই বইটির রচনাকাল পাওয়া যায় "শাকে বসু গ্রহযিতে মনুনৈব যুক্তে" অর্থাৎ ১৪৯৮ শক(১৫৭৬-৭৭ খ্রী:) এই পাঠই সঙ্গত। (বসু-৮, গ্রহ-৯, মনু-১৪, এখন গ্রহ ও মনুকে 'অঙ্কস্য বামা গতি - নিয়ম অনুসারে ক্রমান্বয়ে বাঁ দিক থেকে লিখলে দাঁড়ায় ১৪৯৮ শকাব্দ তা হলে (১৪৯৮ + ৭৮) খ্রী: অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রী: এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে)।

'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে কবিকর্ণপূর চৈতন্য-অবতার চক্রের যে আলোচনা করেছেন তা আগে লিখেছি। এবার আমরা এখানে ভগীরথ বন্ধু বিরচিত 'চৈতন্যসঙ্গীতা' (শ্রীযতী সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, প্রথম আনন্দ সং ১৯৮৫) থেকে সংক্ষেপে চৈতন্য-সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করছি ভগীরথ বন্ধুর দৃষ্টিতে।

কবি 'হরে কৃষ্ণ' ষোলনাম মন্ত্রের তন্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। রাধাসহ বৃন্দাবনে লীলা করতে করতে কৃষ্ণের মনে রাধারূপ ধারণের ইচ্ছা জাগল। বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণ রাধার কাছে ঋণী ছিলেন, সেই ঋণ পরি-শোধের জন্যই কৃষ্ণ তাঁর কালরূপ ত্যাগ করে কলিযুগে গৌররূপে রাধাভাব অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হলেন। রাধানাথ মনে মনে ঠিক করলেন ভক্ত রূপে অবতীর্ণ হবেন নবদ্বীপে। নিজের নাম দিয়েই নিস্তার করবেন মহাপাপীকেও। আর এই পথেই পরিশোধ হবে রাধা-রাণীর ঋণ।

এই সব বেদের অতীত নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশের জন্য দ্বাদশ গোপাল, অষ্ট সখী ও নবযন্ত্রীরও অবতার হল। চৌষট্টি প্রধানা গোপী হলেন চৌষট্টি মোহান্ত। বাকি ছয়

জন হলেন ছয় চক্রবর্তী।

কলিযুগে অষ্টসখীরা অবতীর্ণ হলেন এই ভাবে - রাধা > গদাধর, ললিতা > স্বরূপ গোস্বামী; বিশাখা > রায় রামানন্দ; ইত্যাদি।

নবমঞ্জরীরা হলেন যথাক্রমে - রূপমঞ্জরী > রূপ গোস্বামী; লব(ঙ্গ) > সনাতন গোস্বামী, রতি > রঘুনাথ দাস; অনঙ্গ > গোপাল (ভট্ট) ইত্যাদি

দ্বাদশ গোপালের অবতার হল এই রকম— শ্রীদাম > খানাকুল গ্রামের অভিরাম দাস, সুদাম > উদ্ধবানন্দ ইত্যাদি।

অষ্টকবিরাজ হলেন — সুলোচনা > রামচন্দ্র ; ভাণ্ডোদরী > গোবিন্দ ইত্যাদি।

চৌষট্টি ব্রজাঙ্গনা হলেন চৌষট্টি মোহান্ত। এঁদের পরিচয় হল — রত্নপ্রভা > শ্রী আচার্যরত্ন, রতিকলা > রত্নগর্ভ ;

শিব পার্বতীকে বললেন কলিতে হরিনামই জীবের ত্রাণকর্তা। নাম ও নামী অভিন্ন। নামই ত্রিভুবনের সার।

(৫) চৈতন্য চন্দ্রামৃতম - প্রবোধানন্দ সরস্বতী

এই বইটি সংস্কৃতে ১৪৩টি মাত্র শ্লোকের একটি কাব্য। গ্রন্থকারের সবিশেষ পরিচয় অজ্ঞাত। হরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে একজন প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রিয় এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরু রূপে বর্ণিত হয়েছেন। কবিকর্ণপুরের রচিত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় যতি ও সরস্বতী আখ্যায় যে প্রবোধানন্দের নাম আছে, তাঁকেই কেহ গোপাল ভট্টের গুরু মনে করেন।

পুস্তকখানির বর্ণনাভঙ্গি নবদ্বীপ ও পুরীতে শ্রীচৈতন্যকে চাক্ষুষ দ্রষ্টার মত। বহু বর্ণনায় গৌরপারম্যবাদ সুপ্রকট, আবার "একীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য" প্রভৃতি কয়েকটি শ্লোকে (যেমন ১৩, ৫৮ ও ৫৯) বৃন্দাবন যতের মধুরভক্তি ও রাধাবতার তত্ত্বের স্পষ্ট ছায়া দেখা যায়।

গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরবাদে শ্রীচৈতন্যের পুরীর যতিবেশ অপেক্ষা নবদ্বীপলীলার বিবিধ বিচিত্র বস্ত্রমাল্য অলঙ্কারধারী কিশোর গৌরাঙ্গ মূর্তিই অধিক কাম্য। এই কাব্যে পুরীর যতিবেশ ছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলার বেশেরও বর্ণনা আছে (১৩২ শ্লোক) এবং ঐ শ্লোকে "গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ"ও বলা হয়েছে। বৃন্দাবনেরগোস্বামীরা কিন্তু শ্রীচৈতন্যের যতিবেশেরই মাত্র বর্ণনা ও স্তুতি করেছেন নবদ্বীপ লীলার বেশভূষিত মূর্তির কখনও উল্লেখ করেননি। ৬২ শ্লোকে গ্রন্থকার নবদ্বীপের প্রতিও বড়ই আকর্ষণ প্রকাশ করেছেন।

সন্দেহ হয় উত্তরকালের কোনও বাঙালী ভক্ত চাক্ষুষ-দ্রষ্টার ঠাটে কিন্তু অপরের বিবরণ অবলম্বনে এই কাব্যটি লিখেছিলেন এবং তাঁর নামটিও কাল্পনিক হতে পারে। শ্রীচৈতন্যে অনেকের ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকায় তিনি বহু আক্ষেপ করেছেন, অভক্তগণের নিন্দা করেছেন এবং সকলকে শ্রীচৈতন্য ভক্তিতে আহ্বান করেছেন - এসকলই যেন কিছু পরবর্তীকালের মনোভাব সূচনা করে। আমরা এই বইটির বিশেষ ব্যবহার করব না।

(৬) চৈতন্য ভাগবত - বৃন্দাবন দাস

বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত চৈতন্যদেবের প্রথম বাংলাজীবনী। ইতিপূর্বে সংস্কৃতে চৈতন্য-বিষয়ক কাব্য-নাটক-স্তোত্র রচিত হয়েছিল। কিছু কিছু বাংলা পদও রচিত হয়ে থাকবে। কিন্তু পুরাপুরি জীবনী হিসাবে চৈতন্যভাগবত সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কবি তিনখণ্ডে কাব্যের পরিকল্পনা করেছেন : (১) আদিখণ্ড (পনের অধ্যায়ে সম্পূর্ণ), (২) মধ্যখণ্ড (ছাব্বিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ) এবং (৩) অন্ত্যখণ্ড (দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ) মোট একান্নটি অধ্যায়ে বিভক্ত - ছত্র সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। 'চৈতন্য ভাগবতে'র কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য এই গ্রন্থ বাঙালীর এক অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

১) এত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ আর একটিও পাওয়া যায় না।

২) এইটিই সর্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ, যাতে দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্রের বদলে একজন মানুষের জীবন-কথা বর্ণিত হয়েছে।

North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur

120852

- 3 JUL 1998

৩) এই গ্রন্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে তদানীন্তন সমাজের বিশদ ও অবিকল প্রতিফলন। সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে এত অজস্র তথ্য এর পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে।

৪) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এদেশে নাট্যাভিনয় কীভাবে হত তার পরিচয় শুধু চৈতন্য-ভাগবতেই পাওয়া যায়। এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

বৃন্দাবন দাস স্পষ্টভাবে 'চৈতন্য ভাগবতে'র রচনাকাল জানাননি। সুতরাং বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে আমরা এই বইয়ের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

শ্রীচৈতন্যদেব গয়া থেকে ফেরার পরে যে সময় নবদ্বীপে লীলাকীর্তনাদি করছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রী: বৃন্দাবনের জননী নারায়ণী তাঁর কৃপা লাভ করেন। বৃন্দাবন দাস নিজে বলেছেন যে নারায়ণীর বয়স ঐ সময় ছিল চার বছর ('চারি বৎসরের সেই উন্মত চরিত") সুতরাং ১৫০৫ বা ১৫০৬ খ্রী: বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণীর জন্ম হয়। ১৫০৫ খ্রী: তাঁর জন্ম ধরলে ও নারায়ণীর মাত্র ১৩ বছর বয়সের সময় বৃন্দাবন দাসের জন্ম ধরলে, তাঁর জন্ম সাল হয় ১৫১৮ খ্রী:। আর বৃন্দাবন দাস মাত্র ২০ বছর বয়সে 'চৈতন্য-ভাগবত' রচনা করেছিলেন ধরলেও 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল হয় ১৫৩৮ খ্রী:। এইটিই 'চৈতন্যভাগবত'-এর রচনাকালের উর্ধ্বতম সীমা।[৮]

'চৈতন্যভাগবতে' শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত লীলা অতি বিস্তারিত কিন্তু তৎপরবর্তী লীলা সামান্যই বর্ণিত। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় প্রথম বৃহৎ গ্রন্থটি ভক্তসমাজে খুবই আদৃত হয়। গ্রন্থটি পূর্বে চৈতন্যমঙ্গল নামে পরিচিত থাকলেও - যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে ইহা সর্বত্র এ নামেই উল্লিখিত। 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে 'চৈতন্যভাগবত' এই নাম পরিবর্তন সম্বন্ধে বৃন্দাবনের মহান্তেরা বা মাতা নারায়ণীর ভূমিকা থাকতে পারে।

বৃন্দাবন দাসের লেখা চৈতন্যজীবনীর মূল নাম কি ছিল, তা বলা কঠিন। বৃন্দাবন দাস নিজে এর কোন নাম উল্লেখ করেননি। পরবর্তী চরিতকারদের মধ্যে জয়ানন্দ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে বলেছেন "আদি খন্ড - মধ্যখন্ড - অন্ত্যখন্ড"; লোচন দাস বলেছেন "ভাগবত"("জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে") এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন "চৈতন্যমঙ্গল"। সম্ভবত বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থের কোন নাম দিয়ে যান নি, বৈষ্ণবদের মধ্যে যখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, বৃন্দাবন দাস পূর্বজন্মে বেদব্যাস ছিলেন - তখন তাঁরা লোচন দাসের উক্তির উপর ভিত্তি করে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের "চৈতন্যভাগবত" নাম রাখেন।[১] আমি ডঃ অমূল্যসেন মহাশয়ের 'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থটি পড়েছি। বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণী সম্বন্ধে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা আমরা গ্রহন করতে পারি না - তবে গ্রন্থটিতে যে বিষয়গুলি যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে - তা গ্রহন করতে চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন - "বৃন্দাবন দাসের পিতার অনুল্লেখ, সেই সঙ্গে তাঁহাকে ব্যাসের সমান করায় পরবর্তীকালে কোন কোন বৈষ্ণব মহাজন ... হয়তো সন্দেহ করিয়াছিলেন যে ব্যাসের মতোই বৃন্দাবন দাস বুঝিবা অবৈধজাত পুত্র। তাঁহারা স্পষ্টাস্পষ্টি কানীন পুত্র বলিতে সাহস করেন নাই, বলিয়াছেন 'অভর্তৃকার পুত্র' ('মুরারি গুপ্তের কড়চা')। ... যে কোন সূত্র হইতেই হোক সন্দেহ প্রকাশ পাইবার পর বৈষ্ণব 'ঐতিহাসিক' সমাজে এ বিষয়ে কিছু 'গবেষণা' হইয়াছে। ... গবেষণায় মিলিল নারায়ণীর পিতার নাম - নলিন পন্ডিত, নলিন পন্ডিত, শ্রীবাসের বড়ো ভাই। তবে ইনি নবদ্বীপে থাকিতেন কিনা যে তথ্য অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। তারপর পাওয়া গেল প্রেমবিলাসে নারায়ণীর স্বামীর নাম - বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথ।"[১০] চৈতন্য ভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে মনে করা যায়। ইতস্ততঃ নানা বিষয় এবং বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ সম্বন্ধে যে সব কথার উল্লেখ করা হয়েছে - তা থেকে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা সম্ভব।

৭) চৈতন্যমঙ্গল - জয়ানন্দ

জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল রোদনী। শ্রীচৈতন্য একবার পুরী থেকে মথুরা যাবার পথে সুবুদ্ধির গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। জয়ানন্দ তখন শিশু। রোদনীর সন্তান বাঁচত না, তাই নবপুত্রকে যমের কাছে বিস্তাবৎ পরিহারযোগ্য করবার অভিপ্রায়ে তার ডাক নাম হয়েছিল গুইয়া (বা গুইয়া, গু আ = আধুনিক গুয়ে)। শ্রীচৈতন্য এই অশ্রাব্য নাম বদলিয়ে জয়ানন্দ রেখেছিলেন। সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীচৈতন্যের ভক্ত-বন্ধু গদাধরের শিষ্য ছিলেন এবং জয়ানন্দ গদাধরকে এবং নিত্যানন্দ ভক্ত অভিরাম দাসকে দেখেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী চরিতকাররূপে তিনি বৃন্দাবন দাস ছাড়া আরও যে কয়জনের নাম করেছেন তাঁদের রচনাগুলি পাওয়া যায় নাই, হয়তো সেগুলি ছোট রচনা ছিল।

আমরা ড: বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৭১ খ্রী: প্রকাশিত সংস্করণ ব্যবহার করেছি।

জয়ানন্দের রচনা ভক্তসমাজে আদৃত নয়। তিনি ঘটনাবলীর নানারূপ উল্টাপাল্টা করেছেন এবং বৃন্দাবনগোস্বামীগণ নির্দিষ্ট ধারায় না গিয়ে বাউল প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও আজগুবি ব্যাপারও তিনি লোক মাতাবার অভিপ্রায়ে অবতারণা করেছিলেন কারণ তাঁর গ্রন্থ সাধারণ লোকের জন্য পালা গানে গাওয়ার উপযোগী করে রচিত হয়। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - "জয়ানন্দ ১৫৪৮ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।"[১১] চৈতন্যদেবের মৃত্যুবিষয়ক তথ্য অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

৮) চৈতন্যমঙ্গল - লোচন দাস

লোচন সংস্কৃতে সুশিক্ষিত ছিলেন। এ গ্রন্থটি গানের উদ্দেশে রচিত। মুরারির রচনাকে তিনি 'কড়চা'র পরিবর্তে 'গৌরাঙ্গচরিত' বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে এটি পড়ে "পাঁচালী প্রবন্ধে"

অর্থাৎ বাংলা পদ্যে চৈতন্যচরিত রচনা করবার তাঁর বাসনা হয়। কিন্তু মুরারির অতিরিক্ত ও বহু বিষয়ের তিনি অবতারণা করেছেন এবং সেগুলির অধিকাংশই তাঁর প্রকল্পিত বলে মনে হয়। লোচনের পিতা কমলাকর বর্ধমান জেলার কোগ্রামবাসী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ হলেও লোচন কর্ণপূরের রচনার উল্লেখ করেননি এবং গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের রচনার উল্লেখ করেছেন।

লোচন জাতিতে বৈদ্য এবং শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত শ্রীখণ্ডের বৈদ্য নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। নরহরি সরকার গৌরনাগরবাদী ছিলেন। ব্রাহ্মণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা যেমন গোস্বামী আখ্যা পান, অব্রাহ্মণরা তেমনি 'ঠাকুর' আখ্যা পান, যেমন নরহরি, নরোত্তম প্রভৃতি। নরহরি সরকারের বংশ গুরু সম্প্রদায় হয়ে উঠে, এঁদের ব্রাহ্মণ শিষ্যও আছে।

বৃন্দাবন দাস যেমন চৈতন্যচরিতের সঙ্গে নিজ গুরু নিত্যানন্দের মহিমাকীর্তন করেছেন, লোচনও তেমনি তাঁর গুরু নরহরির মাহাত্ম্যবর্ধন ও গৌরনাগরবাদ প্রচার করেছেন। বৃন্দাবন দাস সম্ভবত গৌরনাগরবাদ বিরোধী হওয়ায় কুত্রাপি নরহরির নাম উল্লেখ করেননি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে শ্রীচৈতন্যের পুরীবাসকালেই নরহরির নাম প্রথম দেখা যায় কিন্তু লোচন নবদ্বীপ লীলায়ও নরহরির প্রাধান্য দেখিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর ও শ্রীবাসকে সাধারণত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 'পঞ্চতত্ত্ব' বলা হয় কিন্তু লোচনের আখ্যানে শ্রীবাসের পরিবর্তে নরহরি পঞ্চতত্ত্বে স্থান পেয়েছেন।

লোচনের বর্ণনায় কল্পনাময় ভাববাহুল্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভক্ত সমাজে তাঁর গ্রন্থ আদৃত হয় না। তিনিও গোস্বামী মতানুযায়ী বর্ণনা করেন নাই। সম্ভবত গৌরনাগর-বাদের ভাবসাধনা ও উপাসনা প্রণালী প্রচার তাঁর লক্ষ্য ছিল।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - "লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলের আনুমানিক রচনাকাল স্থির করা খুব কঠিন নয়। তাঁর গুরু ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকার। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নরহরি সরকার জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর শিষ্য লোচন দাসের জন্ম ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নিশ্চয় হয় নি। সুতরাং তাঁর গ্রন্থ-রচনাকালও অনুমান করা যায়। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল রচনার সময় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কেননা চৈতন্যমঙ্গলে আছে,

বৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগৎ মোহিত যার ভাগবত গীতে।।

সুতরাং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত রচনার অন্তত এক পুরুষ অতিক্রান্ত হবার পর লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ১৫৩৮ থেকে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল ...। সুতরাং লোচন দাসের গ্রন্থের রচনা-কালের ঊর্ধ্বতম সীমা হয় ১৫৬০ খ্রী:। দুটি বিষয় থেকে এই ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ সমর্থিত হয়। প্রথমত, লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে', রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে ধৃত জনৈক 'দাক্ষিণাত্য কবি'র শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'পদ্যাবলী' সঙ্কলিত হয়, বৃন্দাবনে রূপ গোস্বামী কর্তৃক 'পদ্যাবলী' সঙ্কলিত হবার পরে তা বাংলাদেশে লোচন দাসের কাছে পৌঁছোবার আগে নিশ্চয়ই অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস সম্পর্কিত অংশটি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য যাধব নামক উড়িয়া গ্রন্থকারের লেখা 'চৈতন্যবিলাস' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত বলে ড: বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, ২য় সং পৃ.২৭৫-২৮৪ দ্র:) এই মত গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করি। একজন উড়িয়া গ্রন্থকারের উড়িয়া ভাষায় রচিত গ্রন্থ বাংলা দেশে প্রচারিত হতে সময় লাগত। যাধবের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের ১৫১৬ সালে বৃন্দাবন দর্শন করে নীলাচলে প্রত্যাগমন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ বই যদি চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায়ও রচিত হয়ে থাকে, তা'হলেও তা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগে বাঙালী গ্রন্থকার লোচনের হাতে পৌঁছেছিল বলে মনে করা যায় না।

লোচনের গ্রন্থের রচনাকালের নিম্নতম সীমা যে ১৫৭৬ খ্রীঃ তা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থে (কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'য়) শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের তত্ত্ব বা পূর্বলীলার নাম লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু লোচন যখন চৈতন্যমঙ্গল লেখেন, তখন এরূপভাবে তত্ত্ব নির্ণীত হইলেও, উহা অন্তরঙ্গজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। সেইজন্য লোচন বলিয়াছেন -

আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি।
অবতার-নির্ণয়-কথা কেমনে বাখানি॥
মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে।
তাহা কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে॥

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর লোচন 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিতে বসিলে এত সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।" (শ্রী চৈ.উ. ২য় সং, পৃ.২৫১)

অতএব ১৫৬০ থেকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।[১২]

৩। চৈতন্য চরিতামৃত - কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

এই গ্রন্থটি ভক্ত-সমাজে অতি প্রামাণিক ও বেদতুল্য বলে মান্য হয় এবং বহুবার ছাপা হয়েছে। এতে শ্রীচৈতন্যের পূরীলীলার বর্ণনা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। ভাষা ও কবিত্বশক্তিতে ইহা মনোরম। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি বলেছেন বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের অনুরোধে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল গোস্বামীমতের ছাঁচে ঢেলে চৈতন্যচরিত, বিশেষতঃ পূরীলীলার বর্ণনা।

কৃষ্ণদাস নিজের পূর্বজীবন সম্বন্ধে সামান্য যাহা বলেছেন তা থেকে জানা যায় তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ ও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কাটোয়ার কিছু উত্তরে, বর্ধমান জেলার নৈহাটির নিকটে ঝামটপুর গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল এবং সেখানে এখনও তাঁর শ্রীপাট আছে। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হন। বৃন্দাবনে রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর গুরু ছিলেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর কাছে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে নানা শ্লোক উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভবত: চৈতন্য তিরোধানের ৬০ থেকে ৭০ বৎসর পরে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। গোস্বামী-শাস্ত্রের সারকথা এই গ্রন্থে সরল ও সরস বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন। ফলে গোস্বামীমত বাংলাদেশে গৃহীত হবার পর তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা ক্রমে বেড়ে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকল বাঙালীর মনে তাঁর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা জন্মে। তিনি বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন।

"ড: বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর এক প্রবন্ধেও এই পুঁথিটি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'উহার কাগজ বা হাতের লেখা দেখিয়া মনে হয় না যে উহা প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন। সালটি মল্লাব্দ হইতে পারে। ... ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন কাগজের চেহারা ঐ পুঁথিতে দেখা যায় না।"(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ২, পৃ.১২২, পাদটীকা)।

ড: মজুমদারের এই অভিমত প্রকাশের পরে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আলোচ্য পুঁথিটি ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে লিপিকৃত হয়েছিল বলে মনে করা চলে না। ড: মজুমদার "১০২০ সাল"কে "মল্লাব্দ" বলে গ্রহণ করতে চান, কিন্তু পুঁথিটি যে ১০২০ মল্লাব্দ বা ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে লিখিত হওয়াই সম্ভব, আমাকে লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশের সর্বশেষ বাক্যে সে কথাও আছে। আমাদের মনে হয়, পুঁথিটি ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দেরও পরে লিখিত, কিন্তু তাতে উল্লিখিত "১০২০ সাল" বঙ্গাব্দই, মল্লাব্দ নয়। পুঁথির "স্বত্বাধিকারী" হিসাবে গোপাল ভট্টের ভৃত্য বংশীদাসের উল্লেখ থাকার জন্য আমরা এই রকম ধারণা করছি। আসলে "১০২০ সাল" এই পুঁথিটির লিপিকাল নয় - এর আদর্শ পুঁথির লিপিকাল। ১০২০ বঙ্গাব্দ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে

যদি 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র একটি পুথি লেখা হয়ে থাকে, তাহলে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ এই গ্রন্থের রচনাকাল হতে পারে না। এদিক দিয়েও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দকে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনা সমাপ্তিকাল বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয়।

অতএব 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচনা ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।[১৩]

১০. চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয় -

এখানে বিজয় মানে আগমন (এবং গমনও) অর্থাৎ অবতরণ। এই পুস্তকের মাত্র একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে এবং তার প্রথম ও শেষাংশ পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির Biblio. Indic গ্রন্থমালায় ইহা অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের সম্পাদনায় ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি "ভুবনমঙ্গল' নামে বর্ণিত হয়েছে।[১৪]

গ্রন্থকার নিজেকে নিত্যানন্দ-শিষ্য ধনঞ্জয় পন্ডিতের শিষ্য বলেছেন। ধনঞ্জয়ের নাম নিত্যানন্দ - পরিকরগণের মধ্যে পাওয়া যায় (কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১১)। গদাধর ও নিত্যানন্দকে চূড়ামণি দাস দেখেছিলেন বলেছেন। সম্পাদক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থখানিকে চৈতন্য-তিরোধানের ১০-১৮ বৎসর পর রচিত মনে করেন। আমরা গ্রন্থটিতে বেশি আস্থা স্থাপন করতে পারিনি এবং গবেষণা গ্রন্থে খুব সামান্য ব্যবহার করেছি।

১১. গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা :

শ্রীচৈতন্যের পুরীজীবনের পরিচারক ভৃত্য গোবিন্দ নামটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির রচনায় সুপরিচিত। এই গ্রন্থে গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের ইতিহাস বড়ই কৌতূককর। শান্তিপুরের অদ্বৈত-প্রভুর বংশীয় জয়গোপাল গোস্বামী ১৮৯৫ খ্রীঃ প্রাচীন কীটদষ্ট গ্রন্থটি ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। প্রকাশের পর হতে বইটির অকৃত্রিমতা নিয়ে প্রাচীন সাহিত্যরসিক ও বৈষ্ণব পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। অনেকেই বইটিকে খাঁটি বলে গ্রহণ করতে পারেন নাই।[১৫]

"গোবিন্দ কর্মকারের কড়চাখানির প্রামানিকতা নিয়ে প্রচুর বাদ বিসংবাদ হয়েছে এমন কি একথাও বলা হয়েছে এটি পুরোপুরি জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রসূত।" ডঃ বিষ্ণুপদ পান্ডা লিখেছেন - সুখের কথা এই কড়চাখানির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে ডঃ নির্মল নারায়ণ গুপ্ত 'শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ কর্মকারের দৃষ্টিতে' শীর্ষক যে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করেছিলেন (১৯৮৩, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি·লিট· উপাধির জন্য প্রদত্ত) তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়েছেন যে গোবিন্দ রচিত মূল কড়চাখানি একটি প্রামাণিক রচনা এবং ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় এটির রচনা সমাপ্ত হয়।"[১৬]

গৌরচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের নিত্যসঙ্গী চৈতন্যভৃত্য গোবিন্দ কর্মকারের 'কড়চার' প্রামাণিকতা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কড়চার ২য় সংস্করণ প্রকাশক আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন ও সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষকের[১৭] আলোচনায় ঐ গ্রন্থের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমরা দাক্ষিণাত্য ভ্রমনে ও গ্রন্থের কিছু জায়গায় গোবিন্দ দাসের কড়চার সাক্ষ্যকেও প্রয়োজনে গ্রহণ করেছি।

কয়েক ক্ষেত্রে তুলনার প্রয়োজন ছাড়া আমরা এই গবেষণাগ্রন্থে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অল্পই ব্যবহার করেছি।

(ক) প্রেমবিলাস - শ্রীখণ্ডের নিত্যানন্দ দাস রচিত। এর মূলাংশ ১৭ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃতের ছায়ায় রচিত হয়ে পরে বিভিন্ন কালে ও স্থানে তাতে আরও অনেক কথা যোগ করা হয়েছে।

(খ) ভক্তি রত্নাকর - নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম রচিত। এই গ্রন্থটি ১৮ শতকের প্রথমার্ধে প্রণীত।

(গ) অদ্বৈতপ্রকাশ - ঈশান নাগর রচিত। গ্রন্থটিতে প্রক্ষিপ্ত সংযোগ হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

(ঘ) ভগীরথ বন্ধুর 'চৈতন্যসঙ্গীতা' - পুস্তিকাখানি প্রায় দেড়শ বছর বাদে পুনর্মুদ্রিত হল (প্রথম আনন্দ সং, ১৯৮৫)। এই ছোট বইখানির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তা সব সম্পাদিকার মুখবন্ধে আলোচিত হয়েছে। আমরা এই গবেষণা গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' আলোচনার সময় সংক্ষেপে সম্পাদিকার আলোচনা তুলে দিয়েছি।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যশতকম্ - শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রণীত, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নীলাচললীলার পার্ষদ এই সার্বভৌম। রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁকে বহু সম্মানদানে নীলাচলে নিয়ে যান। তখন থেকে তিনি নীলাচলেই বাস করতে থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় -

সার্বভৌম হইয়া প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জ্ঞান, এই লয় নাম॥ [১৮]

এবং -

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দন্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে বর্ণিতে॥[১২]

এই শত শ্লোকেই শ্রীচৈতন্যশতক বা সার্বভৌমশতক বলে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই শতকে প্রধানত দৈন্য, প্রার্থনা, বিজ্ঞপ্তি, শ্রীচৈতন্যরূপ গুণাদি, তদভক্ত-প্রশংসা ও অভক্তনিন্দা, নটেন্দ্র গৌরচন্দ্রের স্ফূর্তি-প্রার্থনা (৫২-৬১), তৎকর্তৃক হরিনাম মন্ত্রদান (৬৪), নমস্কার (৬৬-৭০)। নাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আমরা এই গবেষণা গ্রন্থে এ পুঁথির ব্যবহার করিনি। কারণ এর মৌলিকত্ব নিয়ে সন্দেহ আছে।

(চ) নৃসিংহ রচিত "শ্রীচৈতন্য মহাভাগবতম্। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা (১৬১১)। হরিদাস দাস মহাশয় তাঁর "শ্রীশ্রী গৌড়ীয় - বৈষ্ণব-সাহিত্য" (২য় সং) পৃ.১১ তে এই পুঁথি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা তুলে দিচ্ছি - 'এই গ্রন্থের ভাষা সরল। যে পুঁথিখানা পাওয়া গিয়াছে - তাহাতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতিও লিপিকার - প্রমাদ রহিয়াছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত ইহার ঘটনা - পারম্পর্য্যে বা দেশকালাদি ও অসামঞ্জস্য নিবন্ধন গ্রন্থখানা নির্ভরযোগ্য নয় বলিয়াই আমাদের ধারণা হইতেছে।"

এই গবেষণা গ্রন্থে এ পুঁথি থেকে বিশেষ কিছুই গ্রহণ করা হচ্ছে না।

ওড়িয়া, অসমীয়া ও হিন্দী গ্রন্থ

এই গ্রন্থগুলির বিবরণে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় সংবাদের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষিত হয়। জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত এঁদের পাঁচজনকে ওড়িয়া গ্রন্থকার দিবাকর দাস শ্রীচৈতন্যের পুরীলীলার 'পঞ্চসখা' বলেছেন। বাঙালী ভক্তদের সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় কিছুই বলেননি।

অসমীয়া ভক্তদের বর্ণনায় বলা হয়, তাঁদের গুরু শঙ্কর দেবের সঙ্গে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিন্তু তার ঐতিহাসিকত্ব স্থাপন করা যায় না।

নাভা দাসের হিন্দী ভক্তমালে এবং প্রিয়দাস রচিত তার টীকায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁর প্রধান ভক্তদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে। নাভা দাসের রচনায় আংশিক অনুবাদের সঙ্গে ভক্তগণের বিষয়ে অনেক নতুন কথা যোগ করে ১৮ শতকের প্রায় শেষাংশে লালদাস বা কৃষ্ণদাস কর্তৃক বাংলা ভক্তমাল রচিত হয়। ঠিক শ্রীচৈতন্যজীবনের বিষয়ে এ সকল গ্রন্থের বর্ণনা আমাদের প্রয়োজনে অল্পই ব্যবহারযোগ্য।

উপাদান গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তার আলোকে আমরা অতঃপর শ্রীচৈতন্যজীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

এইভাবে ভূমিকার উপসংহারে এসে পড়েছি। এই গবেষণার কাজটি পরিচালনায় অধ্যাপক শিবচন্দ্র লাহিড়ী ও অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের নাম আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এ বিষয়ে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. অঙ্কুশ ভট্টের কাছ থেকে নানা বিষয়ে সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছি।

****

নির্দেশিকা

১. Sushil Kumar Dey, 'Early History of Vaisnava faith and movement in Bengal', Farma K L M. Pr. Ltd. Calcutta, Reprint - 1986, p.34
২. তদেব পৃ.৩৮
৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', জি.ভরদ্বাজ এন্ড কো., কলিকাতা, ১ম সং ১৯৭৪, পৃ.৬৬-৬৭
৪. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ১৯৫৯, পৃ.৭৪
৫. মুরারি গুপ্তের কড়চা - পৃ.৫২-৫৩
৬. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খন্ড, পূর্বার্ধ, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৪র্থ সং ১৯৬৩, পৃ.৩২২
৭. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ১৯৫৯, পৃ.১০১-১০২
৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', জি.ভরদ্বাজ এন্ড কো., কলিকাতা, ১ম সং, ১৯৭৪, পৃ.১২-১৩
৯. তদেব - পৃ.১৮
১০. বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাডেমী, নতুন দিল্লী, ২য় সং, ১৯৯১, ভূমিকা - পৃ.৩
১১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', জি.ভরদ্বাজ এন্ড কো., কলিকাতা, ১ম সং ১৯৭৪, পৃ.১০৩
১২. তদেব পৃ.১০৬-৭
১৩. তদেব পৃ.২০০-২০১

১৪. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা, ১ম আনন্দ সং, ১৯৯১, পৃ.২৯১-৯২

১৫. বিমানবিহারী মজুমদার, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ১৯৫৯, পৃ.৪০৪

১৬. মাধব পট্টনায়ক, 'শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব', (দে'জ ১ম সং, ১৯৯০), কলিকাতা পৃ.১১

১৭. নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, 'গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা - প্রামাণিকতা বিচার', সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯২

১৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, জেনারেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১ম সং, ১৩৬৮ সাল, পৃ.১৮৪

১৯. তদেব পৃ.১৮২